সুপ্রিয় শিক্ষক এবং সহপাঠীবৃন্দ,
আজ আমরা যে চলচ্চিত্রটি উপস্থাপন করছি, তার নাম "জীবন থেকে নেওয়া", যার প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের আগের সময়ে—পূর্ব পাকিস্তান পর্বে, বিশেষ করে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যকার রাজনৈতিক ইতিহাসে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসী কাব্যগ্রন্থের দুরন্ত আশা কবিতায় তিনি বলেছেন, ভদ্র ,শান্ত শিষ্ট বাঙালি জাতি তৈলঢালা, ক্লিষ্টগতিসম্পন্ন, স্নিগ্ধ দেহ বিশিষ্ট, যা নিদ্রারসে পরিপূর্ণ। তিনি এভাবে অলস, গৃহের প্রতি প্রবল আকর্ষণসম্পন্ন জীবন যাপন করার থেকে, মরুভূমির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত লড়াই করে টিকে থাকা আরব বেদুইন জাতির ন্যায় জীবন-যাপন করার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তান বেশিরভাগই পর্বত পাহাড় ও মরুভূমি ছিল, স্বভাবতই তাদের জীবনযাত্রা বাঙালি থেকে অনেক কঠিন ছিল, তাই অনেকেই বাঙালি জাতিকে নিকৃষ্ট মনে করত। কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান দেখিয়েছেন , নিকৃষ্ট মনে করা বাঙালি জাতি বিপদের সময় কিভাবে একই সাথে ঘরে বাইরে সমানভাবে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। তিনি এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের সমাজ ও রাজনীতির বাস্তব চিত্রকে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রতীকধর্মীভাবে তুলে ধরেছেন। চলচ্চিত্রের মূল প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে একটি পরিবারের মাধ্যমে, যেখানে একজন স্বৈরাচারী নারী পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর দমন–পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। এই নারী চরিত্রটি আসলে তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের প্রতীক—যারা পূর্ব পাকিস্তানের, অর্থাৎ আমাদের বাঙালি জাতির ওপর নানা রকম শোষণ, বৈষম্য ও অত্যাচার চালিয়েছে।
চলচ্চিত্রটি শুধুমাত্র একটি পারিবারিক দ্বন্দ্ব বা গৃহকোন্দল নয়—এর ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি জাতির জাগরণ, সংগ্রাম, ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান বাঙালিদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করছিল, অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করছিল, এমনকি সাংস্কৃতিকভাবেও দমিয়ে রাখছিল। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ছাত্র আন্দোলন, সাংবাদিক দমন, ভোট অধিকার—সব কিছুর স্পর্শ এই চলচ্চিত্রে পাওয়া যায়।
এই চলচ্চিত্রে প্রতিটি চরিত্র , সেই সময়ের সমাজের এক একটি প্রতীক। যেমন, স্বৈরাচারী বউটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি, ভাইয়েরা হলো নির্যাতিত বাঙালি জনগণ, প্রতিবেশীরা হলো সাধারণ সমাজ, যারা কখনও প্রতিবাদ করে, আবার কখনও নিরব থাকে।
জহির রায়হান এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের দেখিয়েছেন, একটি পরিবারেও যখন শোষণ চলে, তখন সেখানে শান্তি থাকে না। তেমনি, একটি রাষ্ট্রেও যদি একটি জাতিগোষ্ঠীর ওপর অন্যায় করা হয়, তবে সেখানে বিদ্রোহ অনিবার্য। এই চলচ্চিত্রটি স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে আমাদের মানসিক প্রস্তুতির অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল।
সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর বিষয় হলো, জহির রায়হান চলচ্চিত্রটি সরাসরি রাজনৈতিক না করে বরং প্রতীকীভাবে এমনভাবে তৈরি করেছেন, যা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চোখ এড়িয়ে গেলেও জনগণের হৃদয়ে গেঁথে যায়। এটাই ছিল তাঁর কৌশল—চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটানো।
সর্বোপরি, বলা যায় "জীবন থেকে নেওয়া" কেবল একটি চলচ্চিত্র ছিলনা বরং এটি ছিল প্রতিরোধ-প্রতিবাদের ভাষা। এটি ঐ সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র, যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং শিক্ষণীয় এবং বাঙালি জাতিকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে।

ধন্যবাদ সবাইকে। পরবর্তী অংশ আমার দলের সদস্য দ্বারা উপস্থাপিত হবে।